ঘুমন্ত সুন্দরী ও বিমান

গাব্রিয়েল গারসিয়া মারকেজ

মেয়েটি সুন্দরী, তন্বী। রুটি-রঙ কোমল ত্বক। চোখ পেস্তা-সবুজ। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা টানটান চুল। চেহারায় প্রাচীন যুগের আবেশ, বুঝিবা দ্বীপময় ভারত বা আণ্ডিস। পোশাকে সূক্ষ্ম-রুচি—লিণ্ডস-এর চামড়ার জ্যাকেট, র-সিল্কের ব্লাউজে হালকা ফুল তোলা, রেশমী পাৎলুন, জুতো সরু বুগনভেলিয়া ডোরা। বেড়াল ও চিতাবাঘের মাঝামাঝি প্রাণী। সে যখন আমার পাশ দিয়ে সিংহিনীর মতো চলে গেল তখন আমি প্যারিসের শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টে নিউইয়র্কের ফ্লাইট ধরার জন্য চেকিং লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। ভাবলাম, 'এর চাইতে সুন্দরী নারী আমি দেখিনি কখনো।' যেন এক দৈব আবির্ভাব মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলো টার্মিনালের জনতার মধ্যে।

সকাল নটা। সারারাত বরফ পড়েছে, শহরের রাস্তায় অন্যদিরে চেয়েও বেশি যানজট। আর হাইওয়ে আরো বেশি শ্লথগতি, দুপাশে ট্রেইলার ট্রাকগুলি সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো, মটোর গাড়ির ধোঁয়া ঠাণ্ডার মধ্যে সাদা। অবশ্য বিমানবন্দরের ভিতরে বসন্ত।

আমি দাঁড়িয়েছিলাম এক ওলন্দাজ মহিলার পিছনে যিনি তাঁর এগারোটা সুটকেসের ওজন নিয়ে একঘণ্টা তর্ক করলেন। সবে বিরক্ত হতে শুরু করেছি। তখনই ঐ ক্ষণিক আবির্ভাবে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো, তাই ঐ একঘণ্টা ব্যাপী বিতর্কের পরিসমাপ্তি কী হলো তা জানার অবস্থা আর আমার রইলো না। চমক ভাঙলো যখন কাউন্টারের মেয়েটির ডাকে। অন্যমনস্কতার অভিযোগ জানিয়ে সে আমাকে মেঘের রাজ্য থেকে নামিয়ে আনলো। ঢোঁক গিলে প্রশ্ন করলাম সে প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ায় বিশ্বাস করে কিনা। 'অবশ্যই', সে জবাব দেয়, 'অন্য কোন রকম প্রেম সম্ভব নয়।' কম্পুটারে চোখ নিবদ্ধ রেখে সে জানতে চায় আমি কোন অংশে আসন চাই—স্মোকিং না নন-স্মোকিং।

'স্মোকিং নন-স্মোকিং—যা হোক। শুধু ঐ মহিলাটি যাঁর এগারোটা সুটকেস তাঁর পাশে না হলেই হোলো।' আমি সচেতন বিদ্রূপের সঙ্গে বলি।

মাপা হাসি হেসে মেয়েটি বুঝিয়ে দেয় যে আমার রসিকতা সে উপভোগ করেছে, কিন্তু কম্পুটারের পর্দা থেকে চোখ সরায় না।

'একটা নম্বর বাছুন—চিন, চার, অথবা সাত।' সে বলে।

'চার'।

বিজয়িনীর হাসিতে তার মুখ ঝলসে উঠলো। 'পনেরো বছর কাজ করছি এখানে, আপনিই প্রথম সাত নম্বরটা বাছলেন না।'

বোর্ডিং বাসে সিট নম্বর লিখে অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে ফেরৎ দিলো সে এবং তারপর এই প্রথম আমার দিকে তাকালো তার আঙুর-রঙ চোখ তুলে। সেই সুন্দরীকে পুনর্বার না দেখা পর্যন্ত ঐ চোখের পরশটুকুই আমার লাভ। কারণ তারপরই সে আমাকে জানালো যে শার্ল দ্যগল বন্ধ, এবং সমস্ত ফ্লাইট বিলম্বিত।

'কতোক্ষণের জন্য?'

'ঈশ্বর জানেন।' একটু হাসলো মেয়েটি। 'আজ সকালে রেডিওতে বলেছে এ বছরের সব চাইতে বড়ো তুষার-ঝড় আসবে আজ!'

ভুল বলেছিলো। ঝড়টা ছিলো এই শতকের সবচাইতে বড়ো দস্যু ঝটিকা। প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে অবশ্য বসন্ত জাগ্রত, ফুলদানিতে তাজা গোলাপ ও যন্ত্রবাহিত বাজনা স্রষ্টাদের অভিপ্রেত স্বর্গীয় শান্তি বহন ক'রে আনছে। মনে হলো ঐ সুন্দরীও তো এটাই স্বাভাবিক আশ্রয়। নিজের দুঃসাহসে নিজেই কিঞ্চিৎ চমকিত হয়ে এদিক ওদিক খোঁজ করলাম। কিন্তু অধিকাংশ যাত্রীই বাস্তবের জলজ্যান্ত মানুষ পুরুষেরা ইংরিজি খবরের কাগজ পাঠরত এবং তাঁদের স্ত্রীরা জানালা দিয়ে তাকিয়ে বরফচাপা মৃত প্লেন ও দূরের তুষারাবৃত কারখানা দেখতে দেখতে অন্য কারু কথা ভাবছেন। দুপুর হতে হতে বসবার জায়গা সব ভর্তি এবং অসহ্য গরম। টাটকা বাতাসের জন্য অপেক্ষাগৃহর বাইরে বেরিয়ে এলাম।

অবিশ্বাস্য দৃশ্য বাইরে। কতো রকম লোক যে ভিড় করে আছে! সাধারণ ওয়েটিং রুম তো ঠাসা বটেই, দম আটকানো করিডরও ভরা, এমনকি সিঁড়িতেও, মেঝেতেও—সর্বত্র মানুষ, পোষা প্রাণী, বাচ্চা কাচ্চা, লটবহর নিয়ে কেউ কেউ মাটিতে সটান শুয়ে পড়েছে। প্যারিসের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আমাদের এই স্বচ্ছ প্লাস্টিকের প্রাসাদ এক মহাজাগতিক ক্যাপসুলে রূপান্তরিত। না ভেবে পারছি না যে এই দমিত জনতার ভিড়ের মধ্যে কোথাও বা কোথাও সেই সুন্দরীও আছে, এই আকাশকুসুম চিন্তা আমাকে অপেক্ষা করার শক্তি ও সাহস জোগালো।

লাঞ্চের সময় আসতে আসতে বুঝতে পারলাম যাকে বলে ভরাডুবি তাই হয়েছে আমাদের। সাতটা রেস্তোরার সামনেই দীর্ঘ লাইন, বাফেটেরিয়া, বার—সব ভর্তি। তিন ঘণ্টার মধ্যেই সব বন্ধ হয়ে গেলো কারণ খাদ্যপানীয় নিঃশেষ। বাচ্চারা-মুহূর্তের জন্য মনে হলো পৃথিবীর সমস্ত বাচ্চা এখানে জড়ো হয়েছে—সকলে একযোগে কাঁদতে শুরু করলো এবং সমবেত ভিড় থেকে যূথবদ্ধ প্রাণীর গন্ধ উত্থিত হতে লাগলো। জীবিত থাকার সহজাত প্রবৃত্তিই ছাড়া এই অবস্থায় প্রাণরক্ষা অসম্ভব। হুটোপুটির মধ্যে বাচ্চাদের দোকান থেকে শেষ দুই কাপ ভ্যানিলা আইসক্রীম কোনোক্রমে সংগ্রহ করেছি। খদ্দের চলে যাওয়ায় ওয়েটাররা ইতিমধ্যেই চেয়ারগুলো টেবিলের উপর তুলে দিচ্ছে। আমি কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে খাচ্ছি—শেষ কার্ডবোর্ডের কাপ ও শেষ কার্ডবোর্ডের ছোট্ট চামচ হাতে আয়নায় দেখছি নিজেকে আর ভাবছি সুন্দীরর কথা।

নিউইয়র্কের যে ফ্লাইট সকাল এগারোটায় ছাড়ার কথা সেটা ছাড়লো রাত আটটায়। আমি যতক্ষণে প্লেনে উঠলাম, প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য যাত্রীরা প্রায় সকলেই ততক্ষণে আসন গ্রহণ করেছেন। স্টুয়ার্ড আমাকে আমার সিটে পৌঁছে দিলো। হঠাৎ হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার জোগাড়। আমার পাশের সিটে জানলার ধারে অভ্যস্ত যাত্রীর স্বাভাবিকতায় সুন্দরী আসন নিচ্ছে। 'এটা যদি লিখি লোকে বলবে অবিশ্বাস্য' ভাবলাম। তোতলাতে তোতলাতে বললামও কিছু তাকে যা সে শুনতে পেলো না।

এমনভাবে সে গুছিয়ে বসলো যেন বহু বছর ওখানে বাস করবে, ঠিক ঠিক জায়গায় ঠিক ঠিক জিনিস, সব গুছোনো গাছানো, আদর্শ সংসারের মতো সবকিছু হাতের নাগালে। ইতিমধ্যে স্টুয়ার্ড নিয়ে এসেছে আমাদের স্বাগত-শ্যাম্পেন। তার গ্লাশটা এগিয়ে দিতে গিয়েও ঠিক সময়ে চেপে গেলাম—ভাগ্যিস—-কারণ সে চাইলো শুধু এক গ্লাশ জল এবং প্রথমে অবোধ্য ফরাসিতে, তারপর সামান্য-বোধ্য ইংরিজিতে স্টুয়ার্ডকে বললো কোনো কারণেই যেন তাকে ঘুম থেকে তোলা না হয়। তার উষ্ণ, গভীর কণ্ঠস্বর প্রাচ্যের বিষণ্ণতার আমেজ।

স্টুয়ার্ড জল এনে দিলে সে একটা কসমেটিক বক্স বার করলো ঠাকুমার ট্রাংকের মতো যার কোণাগুলি তামা দিয়ে মোড়া। সেটা কোলের উপর রেখে সে নানারঙের বড়ির মধ্য থেকে দুটো সোনালি বড়ি বেছে নিলো। সব কিছুই অতি গম্ভীর ভাবে, নিয়মসহকারে সে করলো, যেন আজন্ম তার জীবনে কোনো অভাবিত আকস্মিক ঘটনা ঘটেনি। এরপর জানালার শেড টেনে দিয়ে, জুতো না খুলেই কোমর পর্যন্ত কম্বলে ঢেকে, চোখে ঘুমের ঠুলি দিয়ে, আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। একবারও না জেগে, ভঙ্গির সামান্যতম বদল না করে, নিউইয়র্কের যাত্রাপথের আটটি অনন্ত ঘণ্টা ও বাড়তি বারো মিনিট সময় সে টানা ঘুমোলো।

আবেগমধুর এক যাত্রা। চিরকাল আমি বিশ্বাস করে এসেছি যে সুন্দরী রমণীর চাইতে সুন্দর আর কিছু নেই প্রকৃতিতে, গল্পের নায়িকার মতো আমার নিদ্রাতুরা পার্শ্ববর্তিনীর মায়াজাল এক মুহূর্তের জন্যও কাটাতে পারলাম না। উক্ত স্টুয়ার্ড প্লেন ছাড়ামাত্র উধাও হলো, তার জায়গায় যে এলো সে দেকার্ত-প্রতিম যুক্তিবাদী এক সেবক। সে সুন্দরীকে জাগাবার চেষ্টা করলো প্রথমে একটি প্রসাধন থলি উপহার দিতে ও পরে গান শোনার ইয়ারফোন দিতে। প্রথম স্টুয়ার্ডকে সুন্দরী কী নির্দেশ দিয়েছে আমি সেটা জানালাম। কিন্তু এই দেকার্ত-বংশধর স্বকর্ণে না শুনে ছাড়বে না যে সুন্দরী এমনকি খেতেও চায় না। স্টুয়ার্ড স্বয়ং এই নির্দেশ তাকে পুনর্জ্ঞাপন করলো, তা সত্ত্বেও সে আমাকে অভিযোগ জানালো, কেন সুন্দরী তার গলায় বিরক্ত না করার নোটিশ ঝোলায়নি।

নিঃসঙ্গ নৈশ আহারের সঙ্গে আমি নিঃশব্দে বলে চললাম সেইসব কথা যা সুন্দরী জেগে থাকলে আমি তাকে বলতাম। এমন নিথরভাবে সে ঘুমোচ্ছিলো যে একসময় আমার ভয় হলো যে বড়িগুলি সে খেয়েছিলো তা ঘুমের বড়ি নয়, মরণ-বড়ি। প্রতিটি পানীয়তে চুমুক দেওয়ার আগে আমি আমার গ্লাস তুলে বললাম, 'তোমার স্বাস্থ্য, সুন্দরী।'

খাওয়ার পর আলো কমিয়ে সিনেমা দেখানো সুরু করলো যা কেউ দেখলো না, পৃথিবীর ভরা আঁধারে আমরা দুজন শুধু। শেষ হয়ে গেছে শতকের দুরন্ততম ঝড়, আটলান্টিকের রাত্রি বিপুলা ও স্বচ্ছ, নক্ষত্রকুঞ্জের মধ্যে বিমান যেন গতিহীন। ইঞ্চি ইঞ্চি করে তাকে বুঝতে চাইলাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এবং প্রাণের একমাত্র প্রমাণ পেলাম তার কপালের কুঞ্চনে যেখানে স্বপ্নের ছায়া জলের উপর মেঘের মতো ভেসে চলেছে। গলায় একটি সরু হার, এতো সরু যে তার সোনালী চামড়ার সঙ্গে মিশে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, নিখুঁত কানে দুলপরার ফুটো নেই, নখে সুস্বাস্থ্যের গোলাপি, বাঁ হাতে একটি সাধারণ বালা। তাকে দেখে যেহেতু কুড়ি বছরের

বেশি মনে হয়না, নিজেকে এই বলে ভরসা দিলাম ওই বালা বিয়ের চিহ্ন নয়, হয়তো কোনো অলীক বাগদাগের চিহ্ন।

'আমার শৃঙ্খলিত বাহুর এত কাছে তুমি, ঘুমন্ত, নিশ্চিন্ত, বিশুদ্ধ রেখাবয়ব, ত্যাগের পরিপূর্ণ, নিষ্ঠাবতী প্রতিকৃতি।'

সফেন শ্যাম্পেনের তরঙ্গ-বাহিত হয়ে জেরাডো দিয়োগোর পংক্তি বারবার আবৃত্তি করে চলি। আমার আসনের পিঠ নামিয়ে ঠিক তার সমান্তরালে শুয়ে পড়লাম। বিবাহিত শয্যার চাইতেও ঘনিষ্ঠ। তার নিশ্বাসের আবহাওয়াও তার কণ্ঠস্বরের মতো, আর চামড়ার সূক্ষাতিসূক্ষ নিঃশ্বাস সৌন্দর্যের সুবাস ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। অবিশ্বাস্য! গত বসন্তে ইয়াসুনারি কাওয়াবাটার একটা চমৎকার উপন্যাস পড়েছিলাম যাতে কিয়োটোর প্রাচীন অভিজাতবংশীয়েরা বিপুল অঙ্কের অর্থ দিচ্ছেন শহরের সুন্দরীতমাদের নেশাগ্রস্থ ও নগ্ন অবস্থায় সারা রাত ধরে শুধু দেখবার জন্য। একই বিছানায় শায়িত তাঁরা যখন প্রেম-লিপ্সায় কাতর। সুন্দরীদের জাগানো চলবে না, ছোঁয়া চলবে না, তাঁরা সে চেষ্টাও করতেন না কারণ আনন্দের উৎসটাই হলো তাদের নিদ্রিত দেখা। সেই রাত্রিতে নিদ্রালসা সুন্দরীকে দেখতে দেখতে আমি শুধু ঐ প্রাচীনদের সূক্ষ্ম রুচি বুঝতে পারলাম তাই নয়, নিজেও তাদের একজন হয়ে গেলাম।

শ্যাম্পেনের নেশায় আন্দোলিত আমি ভাবলাম, 'কে জানতো যে আমি এই অর্বাচীন কালে প্রাচীন বিয়োতোর অভিজাতে পরিণত হবো'!

সিনেমার মূক দৃশ্যাবলীর বিস্ফোরণের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েও বেশ কয়েকঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙলো তখন মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। বাথরুমে গেলাম। আমার পিছনে, দুই সারি বাদেই সেই এগারো সুটকেসের মালকিন অদ্ভুতভাবে ছড়িয়ে শুয়ে আছেন যেন যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে আসা বিস্মৃত লাশ। রঙিন পুঁতির চেনে ঝোলানো তাঁর চশমা আসনের সারির মাঝখানে—চলার পথে পড়ে আছে। সেটা আমি তুললাম না এবং তাতে করে কয়েক মুহূর্তের জন্য একটা নষ্ট দুষ্ট আনন্দ বোধ করলাম।

শ্যাম্পেনের বাড়তি অংশ শরীর থেকে বার করে দিয়ে আয়নায় নিজেকে দেখে আবিষ্কার করলাম ঘৃণ্য ও কুৎসিত প্রেমের অভিশাপ কী ভয়ানক হতে পারে। কোনো সতর্কবাক্য বিনা প্লেনটা হঠাৎ দুলতে শুরু করলো, দুম করে নেমে গেলো। তারপর সোজা হয়ে আবার পুরো স্পিডে এগোলো। আসনে গিয়ে বসার নির্দেশ-বাতি জ্বলে উঠেছে। আমি তাড়াতাড়ি আসনের দিকে এগোলাম, মনে আশা যে ঐ ঝাঁকুনিতে সুন্দরীর ঘুম ভেঙে যাবে, ভয় পেয়ে এবারে সে আমাকে জড়িয়ে ধরবে। তাড়াহুড়োতে সেই ওলন্দাজ মহিলার চশমাটা প্রায় মাড়িয়ে দিয়েছিলাম আর কি, মাড়াতে পারলে খুশিই হতাম। পিছিয়ে গিয়ে চশমাটা তুলে তাঁর কোলের উপর রেখে দিলাম এই কৃতজ্ঞতাবশত যে তিনি আমার আগেই চার নম্বর সিটটি নিয়ে ফেলেননি।

কিন্তু সুন্দরীর ঘুম অপরাজেয়। প্লেনটা যখন শান্ত হলো তখন আমার প্রবল ইচ্ছে হতে লাগলো কোনো অজুহাতে তাকে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘুম ভাঙানোর যাতে আমাদের যাত্রার শেষ ঘণ্টাটি কাটাতে পারি তাকে জাগ্রত দেখে, যদি সে তাতে রেগেও যায়, তবু—তবেই আমি ফিরে পেতে পারি আমার স্বাধীনতা, এমনকি হয়তো আমার যৌবন। কিন্তু পারলাম না। 'দুত্তোর'-—ধিক্কার দিই নিজেকে, 'মেষ লগ্নে জন্মালাম না কেন'।

বিমান মাটি ছোঁবার আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই জেগে উঠলো, এতো সুন্দর ও এতো জীবন্ত যেন সে ঘুমিয়ে ছিলো এক গোলাপ বাগানে। পুরোনো দম্পতির মতো পাশাপাশি যারা রাত কাটায় তারাও প্লেনে ঘুম থেকে উঠে পরস্পরকে সুপ্রভাত বলেনা। সেও বললো না 'ঘুমের মুখোস খুলে ফেলে, তার উজ্জ্বল দুটি চোখ মেলে সে সিটের পেছনটা সোজা করে নিলো, কম্বল সরিয়ে দিলো, চুল ঝাঁকালো, নিজের ভারে তার চুল নিজেই স্বস্থানে গিয়ে পড়লো। সাজের বাক্স আবার হাঁটুর উপর রেখে দ্রুত ও অপ্রয়োজনীয় প্রসাধনে ব্যস্ত রইলো বিমানের দরজা না খোলা পর্যন্ত। অতএব তার আগে সে আমার দিকে তাকালো না। অতঃপর সে তার লিঙস-এর জ্যাকেট পরে নিলো, এবং এগিয়ে গেলো প্রায় আমার পা মাড়িয়ে ; ল্যাটিন আমেরিকান স্প্যানিশে মাপ চাইলো, কোনো বিদায় সম্ভাষণ না করে। আমাদের যুগ্ম রাত সুখের করার জন্য আমি যে এত চেষ্টা করলাম তার জন্য ধন্যবাদ না দিয়ে সে মিলিয়ে গেলো নিউ ইয়র্কের আমাজন জঙ্গলে আজকের রৌদ্রালোকে।

অনুবাদ : মীণাক্ষী দত্ত

[জন্ম ১৯২৮ সালে কলম্বিয়ার আরাকাতায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে সাংবাদিক হিসাবে কর্মজীবন শুরু। Ei Heralda (অগ্রদূত) কাগজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত হন। এই কাগজেই তাঁর বিখ্যাত গল্প "মাকোন্দোয় বৃষ্টি দেখে ইসাবেলের স্বগতোক্তি" প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম ছোট উপন্যাস 'La Hajazasea' (ঝরাপাতা)। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত উপন্যাস 'Cienanog de sole dad' (একাকীত্বের একশ বছর)। ১৯৮২ সালে মার্কেস নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়, বর্তমানে তিনি মেক্সিকোর বাসিন্দা। যদিও তিনি শারীরিক ভাবে অসুস্থ, তবুও তাঁর লেখনী আজও নতুন কথা বলে।]